ত্রৈ-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ • সংখ্যা : ৩
এপ্রিল-জুন-২০১৮

শ্রমিকের ঈদ

মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস
শ্রমিক অধিকার ও আমাদের দায়িত্ব

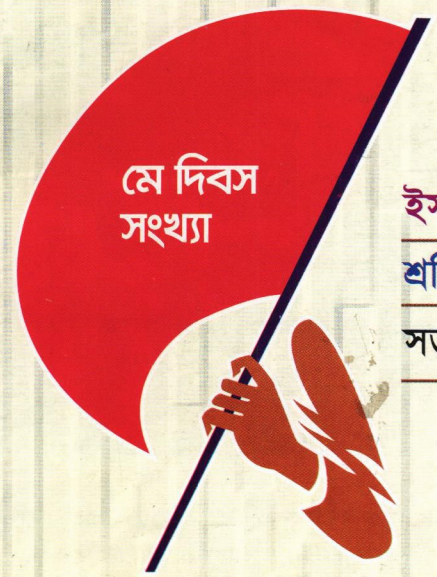

ইসলামে শ্রমিকের প্রতি আচরণ ও অধিকার

শ্রমিক আন্দোলন

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল থামবে কবে?

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস '১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অসচ্ছল শ্রমিকদের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস '১৮ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

অঞ্চল প্রতিনিধি সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম মহানগরীর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-২০১৮ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস '১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগরীর র‍্যালি

শ্রমিক দিবস '১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের র‍্যালি

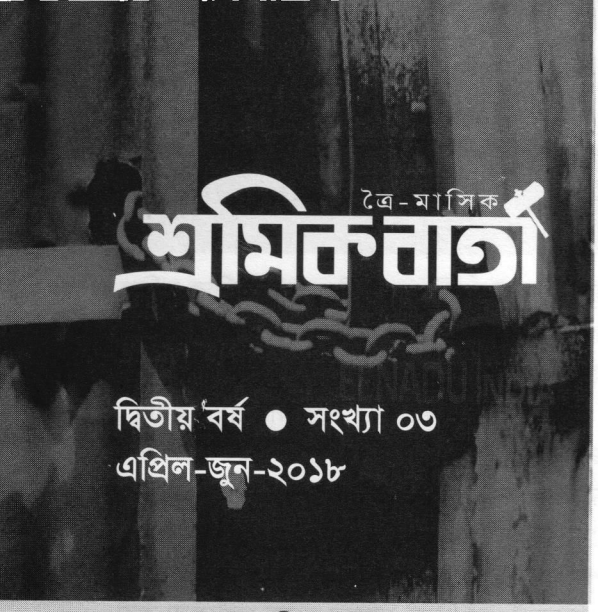

ত্রৈ-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ০৩
এপ্রিল-জুন-২০১৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

নির্বাহী সম্পাদক
আতিকুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
আবুল হাশেম
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন
মুহিব্বুল্লাহ
আশরাফুল আলম ইকবাল

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

প্রকাশকাল
জুন ২০১৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সাজেদুর রহমান শিবলী

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

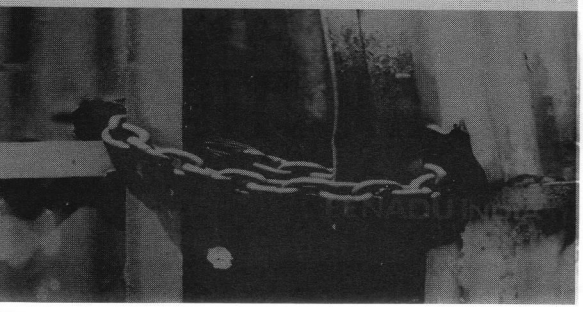

সূচিপত্র

দারসুল হাদীস ৩
মাওলানা আবুল হাসেম

সাক্ষাৎকার ৫
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার
রফিকুল ইসলাম সুজন

মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস, শ্রমিক অধিকার ও আমাদের দায়িত্ব ৮
আতিকুর রহমান

ইসলামে শ্রমিকের প্রতি আচরণ ও অধিকার ১৪
ড. মোবারক হোসাইন

ইসলামী জিজ্ঞাসা : প্রসঙ্গ সাওম ২০
মাওলানা রফিকুল ইসলাম মিয়াজী

শ্রমিক সংগঠন পরিচালনায় শ্রমিক নেতৃত্বের ভূমিকা ২৯
আলমগীর হাসান রাজু

শ্রমিক আন্দোলন ৩১
ফাহিম ফয়সাল

শ্রমিক জিজ্ঞাসা ৩৪
তানভীর হোসাইন

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল থামবে কবে? ৩৬
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন

শ্রমিকের ঈদ ৩৮
আসাদ নূর

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আহবান ৩৯

ফেডারেশন সংবাদ ৪১

সম্পাদকীয়

প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযথ মর্যাদায় ও গুরুত্বের সাথে উদযাপিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। মে দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি স্বপ্ন দেখে তাদের অধিকারের ষোলআনা প্রাপ্তির। বাংলাদেশের শ্রমিকরাও নিঃসন্দেহে এর বাহিরে নয়। কিন্তু আজও আমাদের দেশের শ্রমিকদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিকে তাকালে আমরা আজও দেখতে পাই মালিক শ্রেণী কিভাবে তাদেরকে শোষণ করছে। মালিক শ্রেণীর শোষণের ফলে অসহায়ের মতো শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। আজকের এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন পাচ্ছে না। যেখানে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের জন্য। সেখানে বাংলাদেশের গার্মেন্টগুলোতে এখনও ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। বিনিময়ে বেতন দেয়া হচ্ছে নামমাত্র। যা দিয়ে একজন মানুষ চলাফেরা করা কষ্টকর। আজকে শ্রমিকদের কোন নিরাপত্তা নেই। মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে তারা পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। এ নিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। মহান মে দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। এ জন্য মজদুর মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শাসক, প্রশাসক ও মালিক পক্ষের আরো আন্তরিক হওয়া জরুরি।

সমাজকে বৈষম্যমুক্ত করতে হলে প্রয়োজন ধনী-গরিব, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ রেখা মুছে দেয়া। মালিকরা শ্রমিকের বাড়ি যাবে আর শ্রমিক মালিকের বাড়ি যাবে, শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদেরকেও উপহার দিবে, ধনী তার পাশের গরিব অসহায় ও শ্রমজীবী মানুষদের পাশে দাঁড়াবে, তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখবে। ফলে তারা একে অপরকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। শ্রমিকের কষ্ট মালিক বুঝবে। আর মালিকের ঘরের দামি খাবার-দাবার শ্রমিকরা ঈদের দিনের জন্য হলেও খেতে পারবে। এমনই একটি সাম্য সমাজের স্বপ্ন আমরা দেখি এবং সেই সমাজ বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করি। সেই সমাজটি হচ্ছে ইসলামী শ্রমনীতির সমাজ।

বছর ঘুরে আমাদের মাঝে আবারও সমাগত পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ মানে খুশি। ঈদ মানে সম্প্রীতি। ঈদ মানে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধন। ঈদের আগমনে অনুগত মুসলিম মুছে ফেলে পাপ-পঙ্কিলতার কালিমা। নিভিয়ে দেয় হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-লোভ, আর রাগ-ক্ষোভের আগুন। কি আমির-ফকির, কি শ্রমিক-মালিক, কি উঁচু- নিচু প্রত্যেকে আপন আপন ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে হাতে হাত মেলায়। বছর ঘুরে রমজান শেষে সেই মহিমান্বিত ঈদ আমাদের সামনে হাজির হয়। প্রতি বছর ঈদ আসে ঈদ চলে যায় কিন্তু শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে আনন্দ উৎসব করতে পারে না। নানা সীমাবদ্ধতায় শ্রমিকের ঈদ উৎসবে পরিণত হয় না। শ্রমিকের গায়ের ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ অর্জন করে এক শ্রেণীর মালিক অন্যায় লালসা চরিতার্থ করে। অথচ অগণিত মানুষ খেতে পায় না। অনাহারে অর্ধাহারে কাটে তাদের দিন। ঈদের দিনে নতুন পোশাক দূরে থাক- পেটভরে খাওয়ার মত দু'মুঠো ভাতও অধিকাংশ শ্রমিকের ভাগ্যে জোটে না। তাই মানুষের এই দুর্দশায় কবির উদাত্ত আহবান "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ, তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাকিদ" আসুন মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করি। ঈদকে সামনে রেখে নিজেকে সাধ্যমত বিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। একটুখানি ভালো খাবার, একটা নতুন কাপড় আর কিছু টাকা আমাদের আশপাশের গরিব, দুস্থ ও শ্রমজীবী মানুষদের বিলিয়ে দিলে আমাদের ঈদের আনন্দ বাড়বে বৈ কমবে না। ঈদের দিন মালিক ও ধনিক শ্রেণীর লোকেরা দামি পোশাক পরে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পারফিউম মেখে, গাড়ি হাঁকিয়ে সমগোত্রীয়দের বাড়িতে যায়। আর ধনিক শ্রেণীর মাঝেই দামি উপহার আদান প্রদান করে। এটি অসুন্দর ও সামাজিক বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ এ অবস্থা ও মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। আর এ জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি ও সামাজিক উদ্যোগ। সমাজকে বৈষম্যমুক্ত করতে হলে প্রয়োজন ধনী-গরিব, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ রেখা মুছে দেয়া। মালিকরা শ্রমিকের বাড়ি যাবে আর শ্রমিক মালিকের বাড়ি যাবে, শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদেরকেও উপহার দিবে, ধনী তার পাশের গরিব অসহায় ও শ্রমজীবী মানুষদের পাশে দাঁড়াবে, তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখবে। ফলে তারা একে অপরকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। শ্রমিকের কষ্ট মালিক বুঝবে। আর মালিকের ঘরের দামি খাবার-দাবার শ্রমিকরা ঈদের দিনের জন্য হলেও খেতে পারবে। এমনই একটি সাম্য সমাজের স্বপ্ন আমরা দেখি এবং সেই সমাজ বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করি। সেই সমাজটি হচ্ছে ইসলামী শ্রমনীতির সমাজ।

শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরি দিয়ে দাও

মাওলানা আবুল হাসেম

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية اليماني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

সরল অনুবাদ : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরি দিয়ে দাও। (সুনান ইবনে মাজাহ : ২৪৪৩)

সনদ পর্যালোচনা : অত্র হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কেই বনুলজা ওযিরাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি দুর্বল। কিন্তু অন্যান্য সনদে এ ব্যাপারে ৯টি হাসান এবং ৯টি সহীহ হাদিস পাওয়া যায়। তাই হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ হিসেবেই গণ্য।

রাবি পরিচিতি : অত্র হাদীসের সনদের শেষ স্তর প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) পর্যন্ত পৌঁছেছে যিনি স্বয়ং রাসূল (সা) থেকে শুনেছেন। তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম- আবু আব্দুর রহমান। পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), মাতা যয়নাব। হিজরি তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এ হিসেবে নবুয়াতের দ্বিতীয় বছরে তার জন্ম। উমার (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় ছেলে আবদুল্লাহ (রা) অল্প বয়স্ক ছিলেন ফলে পিতার সাথে সাথে তিনি ইসলামের অনুসারী হন। তিনি ছিলেন প্রথম কাতারের হাফেজে হাদীস। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। হাদীস বর্ণনায় তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, প্রতিটি অক্ষর হুবহু স্মরণ না থাকলে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন না। ইবনে উমার (রা) এর একান্ত খাদেম নাফেরাহিমাহুল্লাহ তার তাবেঈ ছাত্রদেরকে বলতেন, 'এ যুগে যদি ইবনে ওমর বেঁচে থাকতেন, তাহলে রাসূল (সা) এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে তার কঠোরতা দেখে তোমরা বলতে লোকটা পাগল।' হিজরি ৭৪ সনে ৮৩ অথবা ৮৪ বছর বয়সে হজের সময় আততায়ীর বর্শার আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। ফাখনামক কবর স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

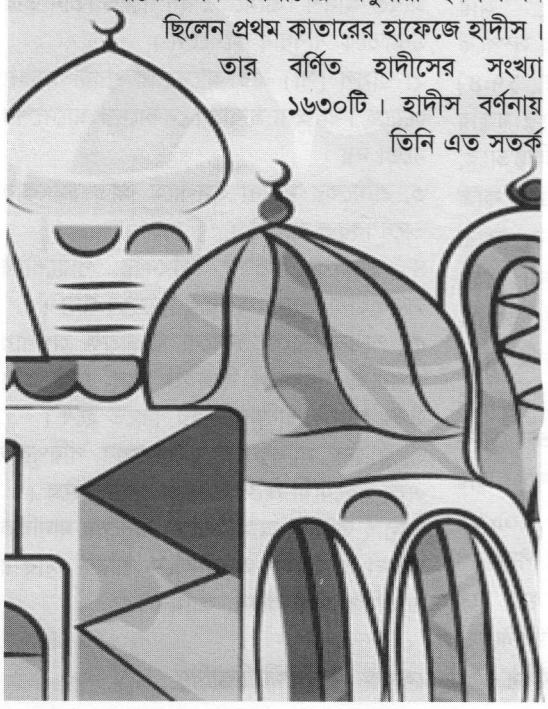

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : রাসূল (সা) কে আল্লাহ তায়ালা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। কুরআনের বাণী:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

"আমি আপনাকে পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ।" (সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭) তাঁর রহমতের পরশে দুর্বলরা ফিরে পেয়েছে তাদের হৃত অধিকার। জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশায় যখন সবলেরাই অপেক্ষাকৃত সবলদের সাথে লড়াই করে সমাজে টিকে থাকতে হচ্ছিল, সে যুগ সন্ধিক্ষণে মানবতার মহান বন্ধু মুহাম্মদ (সা) খেটে খাওয়া, ধুলোয় ধূসরিত শ্রমিক শ্রেণীকে মালিকের ভাই হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পরম মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হাদীসের বাণী:

"তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। কাজেই কারো ভাই যদি কারো অধীনে থাকে তবে সে যা খায়; তাহতে তাকে যেন খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে তাহতে যেন পরিধান করায় এবং সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্যনা করে।" (বুখারি, ইফা: ২৩৭৭)

মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত জীবন বিধান হলো ইসলাম। যা পূর্ণ কল্যাণকামিতাও হিতাকাঙ্ক্ষিতারই জীবনব্যবস্থা। রাসূল (সা) বলেছেন,

الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم

দীন হলো কল্যাণ কামিতা, উত্তম উপদেশ ও সুপরামর্শ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের নেতাগণ এবং সর্বসাধারণের জন্য।" (আবু দাউদ, ৪৮৬০) বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা) সর্বসাধারণ তথা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ব্যাপারে যে কল্যাণ কামিতার বিপ্লবী ঘোষণা দিয়েছেন, শ্রমিকের মজুরি আদায়ের ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ হাদীসের নির্দেশ তারই ধারাবাহিকতা মাত্র।

দিয়ে দাও- "أعطوا" : রাসূল (সা) এর অমিয় এই বাণী শুধু মাত্র সুপারিশমূলক কোন বর্ণনা নয় বরং সরাসরি তা নির্দেশ। যা সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। রাসূল (সা) শুধু এর আদেশ অন্য কোন সাধারণ আদেশের মতো নয় বরং অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। আর উম্মাতের জন্য রাসূলের (সা) নির্দেশ ব্যক্তির নিজস্ব সত্তার চেয়েও বেশি মূল্যবান। যার ওপরেই মুমিন ব্যক্তির দুনিয়াবি শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে। রাসূলের (সা) নির্দেশের বিপরীত কোন রাস্তা মুসলিমের জন্য সিদ্ধ নয়। কুরআনের বাণী:

وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধর, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর, ৫৯:০৭) বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা) এর আনীত নির্দেশনা পরিপালন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মুমিন দাবি করা ও নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআনের বাণী: (সূরা নিসা, ৪:৬৫)

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

"আপনার রবের কসম! তারা কস্মিনকালেও মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক বিবদমান বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে না মেনে নেয়।"

রাসূল (সা) এর নির্দেশের সামনে প্রতিটি বিশ্বাসী ব্যক্তির বক্তব্য এমনই হয়ে থাকে- سمعنا و أطعنا "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।" (সূরা নূর, ২৪:৫১)

সুতরাং রাসূল (সা) বলেছেন, "দিয়ে দাও-"أعطوا" অতএব দিতেই হবে, তা-ই শিরোধার্য।

শ্রমিককে তার বিনিময়- الأجير أجره : শ্রমিক শব্দটি শুনেই ব্যক্তির মানসপটে দু' ধরনের বিপরীতমুখী চিন্তা ধারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। কারো স্মৃতিপটে দয়া, করুণার ঢেউ আছড়ে পড়ে কারণ সে কিছু মানুষকে দেখতে পায় মাত্র দু'মুঠো অন্নের জন্য, অধীনস্থ নিষ্পাপ শিশুগুলোর হাজারো আবদারের মাঝে দু'একটি আবদার পূরণের স্বপ্নে চোখগুলো চিকচিক করে উঠে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পরিশ্রম করে রীতিমত জীবন সংগ্রাম করার অমানবিক দৃশ্য দেখে। বিপরীতে কিছু নিষ্ঠুর হৃদয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি ঠিকরে পড়ে, আর নিজেকে এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে মনে মনে বলে, "তোরা এমনই" তোদের জীবনে আর ভালো কিছু নেই। পরস্পর ভিন্নমুখী দুটি চিন্তার মাঝেই ফুটে উঠে প্রকৃত মানবতার স্বরূপ বনাম স্বার্থপরতার কুৎসিত চেহারা। দুটো চিন্তা কখনও সমান হতে পারে না। একটি চিন্তা ঈমানদার, মানবতাবাদীদের স্বপ্ন অপরটি স্বার্থবাদিতার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কেউ দুর্গম গিরি পথ পাড়ি দেয়া তথা শ্রমিকের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে আর কেউ আমিত্ববাদ ও অহংবোধের শিকার হয়ে শ্রমিকের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এখানেই মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সা) সগৌরবে ঘোষণা করেছেন: "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।" (বুখারি, ইফা : ১৯৪২)

শ্রমিক কারো করুণার ভিখারি নয় বরং নিজের হাতে কামাই করা আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব। রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ি সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট হাত পাতা থেকে উত্তম। কারণ কেউ দিতেও পারে আবার কেউ নাও দিতে পারে।" (বুখারি, ইফা : ১৯৪৪)

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে, রাসূল (সা) একজন শ্রমিককে মানসিকভাবে কতটা অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ শ্রমিক তার পাওনা চায়, চায় সে অধিকার, সে কারো দয়ার ভিখারি নয়। আর পাওনাদারের অধিকার রয়েছে কড়া কথা বলার। হাদীসের বাণী: "তাকে ছেড়ে দাও কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে।" (বুখারি, ইফা:২১৫৮)

ধোঁকাবাজি, প্রতারণা এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত হাজার কোটি টাকার মালিক গগনচুম্বী অট্টালিকা বা নিয়ে হয়তো তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ কায়িক শ্রমে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে নিরেট হালাল উপার্জন করে তার মূল্য স্বার্থবাদী মানুষের কাছে নাও থাকতে পারে কিন্তু উনাদের মূল্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অধিক সম্মানিত হতে পারে। কারণ আহকামুল হাকিমিনের নিকট তাকওয়াবিহীন কর্মের কানাকড়ি মূল্যও নেই। কুরআনের বাণী:

إن أكرمكم عند الله أتقاكم

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেসব চেয়ে সম্মানিত, যে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে ভয় করে।" (সূরা হুজুরাত, ১৩)

ঘাম শুকাবার পূর্বেই-- قبل أن يجف عرقه : আল্লাহু আকবার! কত মানবিক জীবন বিধান! পৃথিবীর কোন মানবতাবাদীরা এমন দৃষ্টান্ত দেখেছে এর পূর্বে? সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানবতার বন্ধু শ্রমিকদের জন্য অধিকারের চূড়ান্ত জয়গান গেয়েছেন। খেয়াল করুন! এক বছর, এক মাস সময় তো দূরের কথা! সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে তথা কথিত মালিকের দুয়ারে পাওনার জন্য ধরনা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না! বরং তার পাওনা দিতে হবে ঘাম শুকাবার পূর্বেই। তবে দু'পক্ষের মধ্যে যদি ন্যায়সঙ্গত চুক্তি বা সামাজিক উরফ প্রচলিত থাকে, তা শরিয়াতের আলোকে নিন্দনীয় হবে না। কিন্তু নির্ধারিত চুক্তির মেয়াদ (দিন শেষে, মাস শেষে, প্রকল্প শেষে তথা চুক্তির আলোকে প্রযোজ্য) শেষ হওয়া সত্ত্বেও যারা পাওনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, টালবাহানা করে শ্রমিকের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে তারা যে মানবতার জঘন্য দুশমন তা মেনে নিতে কেবল প্রতারকরাই আপত্তি করতে পারে। কুরআনের বাণী, "আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা ইসরা, ১৭:৪) যেখানে ঘাম শুকাবার পূর্বেই শ্রমিকের মজুরি আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে বলিষ্ঠভাবে, সেখানে যারা শ্রমিক থেকে পূর্ণ মাত্রায় কাজ আদায় করেও পাওনা দিতে চায় না, তারা পরকালের ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য প্রহর গুনছে। হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হব। আর এক ব্যক্তি যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার থেকে পুরো কাজ আদায় করল অথচ তার পারিশ্রমিক দেয়নি।" (বুখারি, ইফা: ২০৮৬) তাদের প্রতিটি ভালো কাজের বদলা পরকালে পাওনাদারকে দিতে দিতে রিক্ত হস্ত হয়ে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। নাউযুবিল্লাহ! হাদীসে এদেরকেই বলা হয়েছে 'মুফলিস' (মুসলিম, মাকতাবাতুশশামেলা : ২৫৮১)

শুধু আখেরাতের দোহাই দিয়েই এমন নিকৃষ্ট চিন্তার মানুষগুলো পৃথিবীতে ছাড় পেতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর মানুষদেরকে সূরা নাহলের ৯০ নং আয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ন্যায়ের দণ্ড প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এই সমস্ত জুলুমবাজদের থেকে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করিয়ে তাদের উপর পার্থিব শাস্তি কার্যকর করা আবশ্যক।

এক হাতে তালি বাজেনা : মালিক যেমন তার শ্রমিকের অধিকার আদায়ে বাধ্য, তদ্রূপ শ্রমিকেরও দায়িত্ব হচ্ছে তার উপর অর্পিত কর্মসূচি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। তাতে সে অফুরন্ত সাওয়াবের অধিকারী হবে। রাসূল (সা) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হক আদায় করেছে এবং তার মালিকের হকও আদায় করেছে।" (বুখারি, মাকতাবাতুশ শামেলা: ৯৭)

বিপরীতে যারা অর্পিত দায়িত্ব আদায় করে না কিয়ামতের দিন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তারাও তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। রাসূল (সা) বলেন, "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। অধীনস্থ ব্যক্তি তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।" (বুখারি, ইফা : ৮৪৯)

শিক্ষা:

১. রাসূল (সা) বিশ্বমানবতার জন্য চূড়ান্ত এবং জীবন্ত আদর্শ। শ্রমিকের ব্যাপারেও তিনি তার উম্মাতকে সাবধান করেছেন।

২. রাসূল (সা) এর আদের্শের শরয়ী মর্যাদা রয়েছে। যা অন্য সাধারণ নেতাদের আদেশের মতো নয়।

৩. শ্রমিকের মর্যাদা ইসলামে অতি চমৎকার ভাবে বিবৃত হয়েছে।

৪. শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার পরিশোধে টালবাহানা জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।

৫. পাওনাদারকে ঠকানো মারাত্মক অপরাধ অপরাধী পরকালে রিক্তহস্ত হবে এবং তার উপর পার্থিব শাস্তি কার্যকর করতে হবে।

৬. শ্রমিক মালিক একে অপরের পরিপূরক এবং সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মানুষের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক থাকার তাওফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : ইসলামী চিন্তাবিদ

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার মুখোমুখি হয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন শ্রমিক বার্তার সম্পাদনা সহযোগী অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

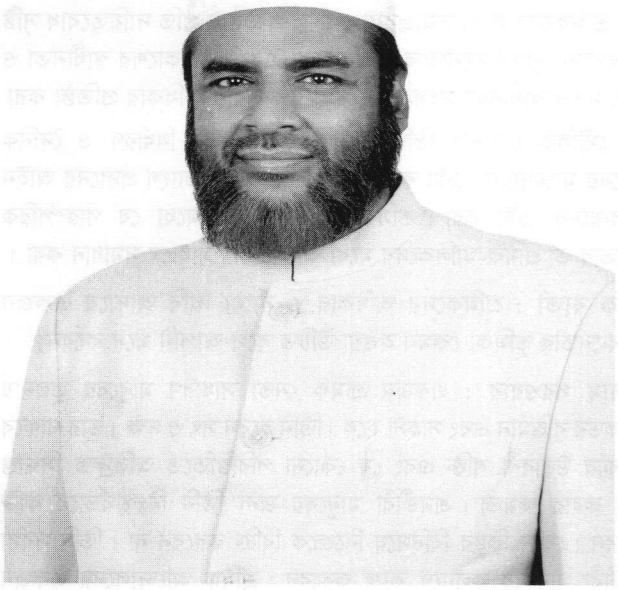

“ যে উদ্দেশ্যে অগণিত শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তার বিনিময়ে দুঃখী, বঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য কতটা বদল হয়েছে? তাদের জীবন যন্ত্রণা কতটা থেমেছে? আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রান্তে অন্নহীনদের কান্না, বস্ত্রহীনদের মর্মব্যথা, কান্না আর নিরাশ্রয়ের আকুতি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। কাজেই শিকাগোর সংগ্রামের ফলে শ্রমিকদের যে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল, যে মজুরি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে তাদের পরিবারের দুঃখ কষ্ট কিছুটা লাঘব হওয়ার কথা ছিল, স্ত্রী-সন্তানদের মুখে দু’বেলা দু’মুঠো ভাত তুলে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটানোর কথা ছিল, তাদের সে উদ্দেশ্য আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ”

শ্রমিক বার্তা : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? যে উদ্দেশ্যে শ্রমিকরা শিকাগোর হে মার্কেটে জীবন দিয়েছিল তাদের সে উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

গোলাম পরওয়ার : শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ১লা মে এক অনন্য গৌরবময় দিন। আজ থেকে ১৩২ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ৮ ঘণ্টা কর্মঘন্টা দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমেরিকার শিকাগো থেকে শুরু করে দেশে দেশে মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য আত্মদান যেন তাদের অধিকারের মূর্ত আর্তনাদ। শিকাগোর সংগ্রাম ১৮৮৬ সাল থেকেই আজকের দিন পর্যন্ত ১৩২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ১৩২ বছর পূর্বে শ্রমিকরা যে আন্দোলন করেছিল তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। যে উদ্দেশ্যে অগণিত শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে তার বিনিময়ে দুঃখী, বঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য কতটা বদল হয়েছে? তাদের জীবন যন্ত্রণা কতটা থেমেছে? আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রান্তে অন্নহীনদের কান্না, বস্ত্রহীনদের মর্মব্যথা, কান্না আর নিরাশ্রয়ের আকুতি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। কাজেই শিকাগোর সংগ্রামের ফলে শ্রমিকদের যে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল, যে মজুরি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে তাদের পরিবারের দুঃখ কষ্ট কিছুটা লাঘব হওয়ার কথা ছিল, স্ত্রী-সন্তানদের মুখে দু’বেলা দু’মুঠো ভাত তুলে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটানোর কথা ছিল, তাদের সে উদ্দেশ্য আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

শ্রমিক বার্তা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন?

গোলাম পরওয়ার: বাংলাদেশ আইন ও নীতিমালা স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয় বাংলাদেশে। মে দিবসে সরকারি ছুটি কার্যকর আছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে মে দিবস পালন করা হয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যে দাবিগুলো নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন হয়ে ছিল সেই দাবি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যকর হয়নি। দীর্ঘ ১৩২ বছরে ও শ্রমিকদের অধিকার আন্দোলন ভাটা পড়েছে। শুধু দিবসকেন্দ্রিক শ্লোগান আর র‍্যালি সমাবেশ করে বিদায় দেয়া হচ্ছে মে দিবসকে।

শ্রমিক বার্তা : বাংলাদেশের শ্রম আইন শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে বলে কি আপনি মনে করেন?

গোলাম পরওয়ার : বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা জন্য আইনের কিছু ধারা পরিবর্তন করা দরকার। আমাদের দেশে শ্রমিক সংক্রান্ত অনেক আইন ও বিধিমালা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক-কর্মচারীরা নানানভাবে জুলুম-অত্যাচার, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। জুলুম থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আল কুরআনের কাছে এবং মানুষের প্রিয়নেতা বিশ্বনবী নবীকুল শিরোমনি ইসলামের দেখানো বাস্তবায়িত পথের দিকে তাহলে মানুষ পেতে পারে মুক্তির সুবাতাস।

শ্রমিক বার্তা : বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

গোলাম পরওয়ার : শ্রমজীবী মানুষগুলিই আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। অথচ শ্রমিকদের মজুরি খুবই সামান্য। শ্রমিকরা যে বেতন পায় তা দিয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। সামাজিক বাস্তবতার আলোকে যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, সেই হারে শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সরকার যে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। এই উদ্যাগকে আমরা স্বাগত জানাই। ইসলামী

শ্রমনীতিতে মজুরি নির্ধারণের মূল মানদণ্ড হলো "শ্রমিক যা খাবে পরবে মালিক ও তাই খাবে পরবে। মৌলিক জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটাই মজুরি নির্ধারণের ইসলামী নীতি। ইসলামী শ্রমণীতি বাস্তবায়ন ছাড়া তা যেহেতু এখন সম্ভব নয় তাই বর্তমানে অন্তত ন্যূনতম পক্ষে শ্রমিকদের মজুরি ১৫/১৬ থেকে ১৮ হাজার টাকা করা উচিত। আমরাও চাই শ্রমিকরা জীবন ধারণের মত খেয়ে পরে যেন শিল্পের উৎপাদন টিকিয়ে রাখতে পারে। আমরা সরকারের কাছে সেই দাবি জানাচ্ছি।

শ্রমিক বার্তা : আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষের মৌলিক কারণ কী কী?

গোলাম পরওয়ার : বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষের অনেকগুলি কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিম্নমজুরি, বকেয়া বেতন, বিনা কারণে ছাঁটাই, হঠাৎ কারখানা বন্ধ ঘোষণা ইত্যাদি। এই সব কারণে শ্রমিকদের আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়। এই আন্দোলন সংগ্রাম প্রয়োজন হতো না যদি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন থাকত। মূলত ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় এ আন্দোলন-সংগ্রাম বেশি হচ্ছে। যদি ট্রেড ইউনিয়ন থাকতো তা হলে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান হলে আন্দোলন সংগ্রামের প্রয়োজন হতো না।

শ্রমিক বার্তা : বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে বলে কি আপনি মনে করেন?

গোলাম পরওয়ার : আমি মনে করি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ব্যতীত বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের জায়গা থেকে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে কম-বেশি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তবে তা আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে নয়।

শ্রমিক বার্তা : দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার সংগঠনের ভূমিকা কতটুকু?

গোলাম পরওয়ার : ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি কল্যাণময় ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৮ সালের ২৩ মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বাংলাদেশ জাতীয় ফেডারেশন (বা.জা.ফে) ০৮। বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে ফেডারেশন আজ ৫০ বছরের পুরাতন ইসলামী পতাকাবাহী শ্রমিক সংগঠন হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দক্ষ, আন্তরিক ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শতশত বেসিক ইউনিয়ন ও পেশাভিত্তিক ফেডারেশন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অব্যাহত গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা মনে করি দেশের নানা প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা এবং সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও আমরা শ্রমজীবী মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে, কথা বলতে গিয়ে, শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও রংপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের শ্রমিক নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং এখনও গ্রেফতার হচ্ছেন।

শ্রমিক বার্তা : শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী হতে পারে?

গোলাম পরওয়ার : প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগঠনের একটি করে নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। এটি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। আমাদের ও দু'টি পরিকল্পনা রয়েছে।

আমাদের পরিকল্পনাগুলো হচ্ছে:

(১) ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা।

(২) আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী রাসূল (সা) এর নির্দেশিত পথে ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

(৩) সাধারণ মানুষের মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা।

(৫) শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব সৃষ্টি করা।

(৬) শ্রমিকদের মধ্যে সমাজরাষ্ট্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মনোভাব জাগ্রত করা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় দর্শন স্বাধীনতা সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ ও দৈনিক জীবনের মানোন্নয়নে চেষ্টা করা এবং প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ প্রদানের আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যে পারস্পরিক মনোভাব তা শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা।

শ্রমিক বার্তা : শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ে একজন শ্রমিকনেতার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

গোলাম পরওয়ার : একজন শ্রমিক নেতা সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিকতর বুদ্ধিমান এবং সাহসী হবে। তিনি হবেন সৎ ও দক্ষ। তার থাকবে চমৎকার উদ্ভাবনী শক্তি এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন। কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করবেন না। তিনি সর্বদা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। শ্রমিক আন্দোলনের একজন নেতার উচিত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা।

শ্রমিক বার্তা : বর্তমান প্রচলিত আইন কিংবা নীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হবে বলে কি আপনি মনে করেন?

গোলাম পরওয়ার : গত ২২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এই সংশোধনী প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ সংশোধনীর প্রস্তাবের নানা ত্রুটিপূর্ণ দিক সম্পর্কে সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে অবহিত করেছে। তা ছাড়া, এ সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তুতের আগে সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পর্যায়ে আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিক নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ সভা করেছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু এসবের কোন প্রতিফলনই অনমোদিত শ্রম আইনের খসড়ায় দেখা যায়নি। ফলে সংশোধিত এ শ্রম আইন নিয়ে দেশের শ্রমিক পরিমণ্ডলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোও এ আইন নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ প্রসঙ্গে হিউম্যান ব্রাইটস ওয়াচ গত ১৬ জুলাই বলেছে এ আইন শ্রমিক অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট নয়। কাজেই বর্তমান প্রচলিত আইন কিংবা নীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি

রফিকুল ইসলাম সুজন

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন শ্রমিক বার্তার সম্পাদনা সহযোগী আশরাফুল আলম ইকবাল

শ্রমিক বার্তা : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী? যে উদ্দেশ্যে শ্রমিকরা হে শহরে জীবন দিয়েছিল তাদের সে উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

রফিকুল ইসলাম সুজন : আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নিয়ে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে যে গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালন হচ্ছে সে আলোকে বাস্তবে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ হচ্ছে না। যে কর্মঘন্টা নির্ধারণের জন্য হে শহরে শ্রমিকরা জীবন দিয়েছিল সে কর্মঘন্টা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় মানা হচ্ছে না। জোর পূর্বক শ্রমিকদের কাছ থেকে ১২-১৬ ঘন্টা কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিকের মজুরি ও ঠিকমত দেয়া হচ্ছে না। যখন তখন শ্রমিককে তার চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। শ্রমআইন থাকলেও তার বাস্তব প্রয়োগ খুবই কম। ফলে সে সময় শ্রমজীবী মানুষের যে অবস্থা ছিল বর্তমানে তার খুব তফাত দেখা যায় না। তাই এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই হে শহরে শ্রমিকরা তাদের যে দাবি আদায়ের জন্য জীবন দিয়েছিল সে দাবি আজও পূরণ হয়নি।

শ্রমিক বার্তা : বাংলাদেশের শ্রম আইন শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে বলে কি আপনি মনে করেন?

রফিকুল ইসলাম সুজন : এখন যে শ্রম আইনগুলো আছে সেগুলো কোন কাজে আসে না। আমরা দেখেছি বিভিন্ন শ্রমিক ছাঁটাই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে যে শ্রমআইন আছে এ আইনগুলো মালিকরা কখনো তোয়াক্কা করে না। যে লেবার কোর্টে মামলাগুলো করা হয়, মামলাগুলো ২-৩ বছর অতিবাহিত হয়। রায় হলে মামলায় যে টাকাগুলো তারা পায় ৩/৪ বছর মামলা চললে যে টাকা খরচ হয় তার থেকে খরচ বেশি হয়। সব মিলিয়ে বর্তমান সময় উপযোগী শ্রম আইন প্রয়োজন আর আমাদের বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো খুবই দুর্বল। মালিক পক্ষ সরকারের সহযোগিতা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার কারণে সেভাবে কোন কার্যক্রম করা যাচ্ছে না বা করতে দেয় না। কোন ফ্যাক্টরিতে ইউনিয়ন করতে গেলে সে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ফ্যাক্টরি ট্রান্সফার করে দেয়া হয় যার কারণে কোন কার্যক্রম সঠিকভাবে করতে পারি না।

শ্রমিক বার্তা : বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

রফিকুল ইসলাম সুজন : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে ৫৩০০ টাকা শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, সে মজুরি দিয়ে আসলে কোন শ্রমিকের জীবন চলে না। বর্তমান বাজার অনুযায়ী বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও আমরা দাবি করেছি পাঁচ সদস্যের ফ্যামিলি যেন চলতে পারে বাবা-মা স্ত্রী দু'টি সন্তানসহ একটি সংসার পরিচালনার জন্য ২৫-২৬ হাজার টাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই দাবি যদি আমরা মালিকপক্ষের কাছে করি তা হলেতো মালিকপক্ষ বলবে উসকানিমূলক কথা শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দেয়ার কথা। এটা আমরা সেভাবে বলতেও পারি না আমরা সাহসও পাই না। ১৬ হাজার টাকার কথা কোনরকম টুকটাক বলছি। তা ছাড়া কথা বলতে গেলেই মামলা হয়। ২০১৬ সালে আশুলিয়া শ্রমিক আন্দোলন হলো তাদের দাবি ছিল, ২০১০ সালে মজুরি বৃদ্ধি হয়েছিল, তেরো সালে হয়েছিল, তিন বৎসর পরে মজুরি বৃদ্ধি হয়েছিল, ঠিক ৩ বছর পর আবারো তারা মজুরি বৃদ্ধির দাবি উত্থাপন করে। কিন্তু এ দাবি বিজিএমই সরকারের সহযোগিতায় পাশ কাটিয়ে যায়। অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হওয়ার পরে এখন যে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ মজুরি বোর্ডের কাছে বিভিন্ন সংগঠনের দাবিগুলো ১৫/১৬ থেকে ১৮ হাজার টাকাও দাবি করে আসছে। আমরাও সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি শ্রমিকরা যেন পরিবার পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করতে পারে সে আলোকে মজুরি নির্ধারণ করা হোক।

শ্রমিক বার্তা : আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষের মৌলিক কারণ কী কী?

রফিকুল ইসলাম সুজন : শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেইতো শ্রমিক আন্দোলন সংগ্রাম হয়। এছাড়া শ্রমিকদের প্রতি আইনবহির্ভূত নীতিমালা আরোপ এবং নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিক বার্তা : দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার সংগঠনের ভূমিকা কতটুকু?

রফিকুল ইসলাম সুজন : আমি মনে করি আমরা যারা শ্রমিক সংগঠনগুলো পরিচালনা করছি। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আমরা ব্যর্থ। আমরা সেভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারিনি। তার জন্য আমরা শ্রমিক সংগঠনগুলো ব্যর্থ মনে করছি। যদি শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারতাম তাহলে ব্যর্থতা আরো কমতো। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছি। আমরা যতটুকু পারছি শ্রমিকদের কল্যাণে আইনগত সহায়তা, শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছি। শ্রমিক সংগঠনের সফলতা ব্যর্থতা থাকবে, তা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

শ্রমিক বার্তা : শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী হতে পারে?

রফিকুল ইসলাম সুজন : আমি আগেও বলেছি এখন যে অবস্থা মালিক সমিতি (বিজিএমইএ) সরকারের সহযোগিতায় শ্রমিক সংগঠনগুলোকে তাদের কার্যক্রমে বাধা দিচ্ছে ফলে আমরা সেভাবে কার্যক্রম চালাতে পারছি না বা সে রকম কার্যক্রম গড়ে তুলতে পারছি না। শ্রমিকরা যে দাবি-দাওয়া করে আসছে সে দাবি-দাওয়াগুলো আমরা যতটুকু পারছি আদায় করে দেয়ার চেষ্টা করছি। একদিকে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলো খুবই দুর্বল অপরদিকে অর্থ ছাড়াতো ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কার্যক্রম সেভাবে পরিচালনা করা যায় না। যেমন ধরেন মে দিবসের পোস্টার করবো, সে পোস্টার করার টাকা আমাদের নাই, আন্দোলন সংগ্রাম করতে হলে প্রচার প্রচারণায় লিফলেট, পোস্টার, বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা-সমাবেশ করতে যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ জোগান খুবই দুর্বল। যার কারণে এভাবে দুর্বল সংগঠন দিয়ে শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম লড়াই করে আমরা এগোতে পারছি না।

শ্রমিক বার্তা : শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ে একজন শ্রমিক নেতার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

রফিকুল ইসলাম সুজন : শ্রমিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করা উচিত। আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ে আমাদের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: বর্তমান প্রচলিত আইন কিংবা নীতির মাধ্যমে শ্রমিকদের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হবে বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর: সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে শ্রম আইনের কিছু কালাকানুন আছে সেগুলো বাতিল করলে যে শ্রম আইন আছে তা বাস্তবায়ন করলে শ্রমিকরা অনেক উপকৃত হবে এবং সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে।

মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস, শ্রমিক অধিকার ও আমাদের দায়িত্ব

আতিকুর রহমান

পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মহান মে দিবস। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনের রক্তস্রোত স্মৃতি বিজড়িত এই মে দিবস। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রতি অবিচারের অবসান ঘটাবার সূতিকাগার বলা হয় মে দিবসকে। প্রায় দেড়শত বছর আগে শ্রমিকদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় শ্রমজীবী মানুষের বিজয়ের ধারা। সেই বিজয়ের ধারায় উদ্ভাসিত বর্তমান বিশ্বের সকল প্রান্তের প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদায় ও গুরুত্বের সাথে সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়ে আসছে মহান মে দিবস। পৃথিবীর মেহনতি মানুষের কাছে এ দিনটি একদিকে যেমন খুবই তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অনেক বেশি আবেগ ও প্রেরণার। বিশেষ করে পৃথিবীর কোটি কোটি শ্রমিক জনগোষ্ঠীর কাছে এ দিনটির ত্যাগ-মহিমা ও তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। কারণ এ দিনটির মাধ্যমে তারা তাদের কাজের প্রকৃত স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই ঐতিহাসিক মে দিবস বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার দিন। তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় তথা অধিকার আদায়ের দিন। শ্রমিকদের অস্তিত্ব ঘোষণার দিন।

মে দিবসের প্রেক্ষাপট : একজন শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অধিকার বা দাবি হলো, তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। উনিশ শতকের গোড়ার দিককার কথা। তখন দেশে দেশে পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। মালিকেরা নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দরিদ্র মানুষের শ্রম কিনে নিতেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হাড়ভাঙা শ্রম দিয়েও শ্রমিক তার ন্যায্যমূল্য পেতেন না। মালিকেরা উপযুক্ত মজুরি তো দিতেনই না, বরং তারা শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধা, মানবিক অধিকার ও দুঃখ-কষ্ট পর্যন্ত বুঝতে চাইতেন না। মালিকেরা তাদের অধীনস্থ শ্রমিককে দাস-দাসীর মতো মনে করতেন। আর তাদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করতেন। সুযোগ পেলেই মালিকেরা শ্রমিকের ওপর চালাতেন নানা শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন। বলতে গেলে শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকারও তখন রক্ষিত হতো না। শ্রমিকের শরীরের ঘাম আর সীমাহীন শ্রমের বিনিময়ে মালিক অর্জন করতেন সীমাহীন সম্পদ অথচ তার ছিটেফোঁটাও শ্রমিকের ভাগ্যে জুটত না। সপ্তাহে ৬ দিনের প্রতিদিনই গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টার অমানবিক পরিশ্রম করতো কিন্তু তার বিপরীতে মিলত নগণ্য মজুরি। যা দিয়ে শ্রমিকের সংসার চলত না, স্বজনের মুখে তিন বেলা খাবার তুলে দেয়া সম্ভব হতো না। পরিবার-পরিজন নিয়ে শ্রমিকের জীবন ছিল দুর্বিষহ। অনিরাপদ পরিবেশে রোগ-ব্যাধি, আঘাত, মৃত্যুই ছিল তাদের নির্মম সাথী। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি-দাওয়ার কথা মন খুলে মালিক সমাজকে বলতে পারতো না। এমনকি তাদের পক্ষ হয়ে বলার মতও কেউ ছিল না। কাজের যেমন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না, তেমনি ছিল না সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি এবং চাকরির স্থায়িত্ব ও মজুরিসহ সকল বিষয় ছিল মালিকের ইচ্ছাধীন বিষয়। তখন নির্ধারিত কোন ছুটি ছিল না, বেতন বা মজুরির কোন স্কেল বা পরিমাণ ছিল না, চরম বিপদের দিনেও শ্রমিকরা ছুটি পেত না। দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিন-রাতে প্রায়ই ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতো তারা। শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়ার কথা বললে মালিকরা তাদের ওপর ক্ষেপে যেতো, এমনকি মালিকদের ভাড়াটে মাস্তানরা তাদের ওপর জুলুম করতো। মালিকরা শ্রমিকদের কলুর বলদের মতো খাটাতো। তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দিতো। এতে শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনাই শ্রমিকের পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে মালিকের সীমাহীন অনাচার, অর্থলিপ্সা ও একপাক্ষিক নীতির ফলে শ্রমিকদের মনে জমতে শুরু করে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও দ্রোহ। এমন অত্যাচার যখন তাদের ওপর চলছিল তখন শ্রমিকরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে তাদের তো প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। ধীরে ধীরে শ্রমিকরা সব শ্রেণীর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করলো। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রথমে ১০ ঘণ্টা কাজের দাবি ও তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য আন্দোলন করলো। বিশ্বের মধ্যে প্রথম 'ট্রেড ইউনিয়ন ফিলাডেলফিয়ার মেকানিক ইউনিয়ন' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। তাদের এ দাবি মালিকপক্ষও মেনে নেয়; কিন্তু মুখ দিয়ে মেনে নিলেও বাস্তবে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন অব্যাহতই রাখে।

১৮৮০-৮১ সালের দিকে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করে Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada [১৮৮৬ সালে নাম পরিবর্তন করে করা হয় American Federation of Labor] এই সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শক্তি অর্জন করতে থাকে। ১৮৮৪ সালে সংঘটি '৮ ঘন্টা দৈনিক মজুরি' নির্ধারণের প্রস্তাব পাস করে এবং মালিকও বণিক শ্রেণীকে এই প্রস্তাব কার্যকরের জন্য ১৮৮৬ সালের ১লা মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। তারা এই সময়ের মধ্যে সংঘের আওতাধীন সকল শ্রমিক সংগঠনকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংগঠিত হওয়ার পুনঃপুন আহবান জানায়। প্রথম দিকে অনেকেই একে অবাস্তব অভিলাষ, অতি সংস্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু বণিক-মালিক শ্রেণীর কোন ধরনের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদী ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। এ সময় অ্যালার্ম নামক একটি পত্রিকার কলাম- 'একজন শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজ করুক কিংবা ১০ ঘন্টাই করুক, সে দাসই' যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালে।

মে দিবসের ইতিহাস: ১৮৬০ সালে শ্রমিকরাই মজুরি না কেটে দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রম নির্ধারণের প্রথম দাবি জানায়। কিন্তু কোন শ্রমিক সংগঠন ছিল না বলে এই দাবি জোরালো করা সম্ভব হয়নি। এই সময় সমাজতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। শ্রমিকরা বুঝতে পারে বণিক ও মালিক শ্রেণীর এই রক্ত শোষণ নীতির বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হতে হবে। ১৮৮০-৮১ সালের দিকে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করে Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada [১৮৮৬ সালে নাম পরিবর্তন করে করা হয় American Federation of Labor] এই সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে শক্তি অর্জন করতে থাকে। ১৮৮৪ সালে সংঘটি '৮ ঘন্টা দৈনিক মজুরি' নির্ধারণের প্রস্তাব পাস করে এবং মালিকও বণিক শ্রেণীকে এই প্রস্তাব কার্যকরের জন্য ১৮৮৬ সালের ১লা মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। তারা এই সময়ের মধ্যে সংঘের আওতাধীন সকল শ্রমিক সংগঠনকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংগঠিত হওয়ার পুনঃপুন আহবান জানায়। প্রথম দিকে অনেকেই একে অবাস্তব অভিলাষ, অতি সংস্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু বণিক-মালিক শ্রেণীর কোন ধরনের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদী ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। এ সময় অ্যালার্ম নামক একটি পত্রিকার কলাম- 'একজন শ্রমিক ৮ ঘন্টা কাজ করুক কিংবা ১০ ঘন্টাই করুক, সে দাসই' যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালে। শ্রমিক সংগঠনদের সাথে বিভিন্ন সমাজতন্ত্রপন্থী দলও একাত্মতা জানায়। ১লা মে-কে ঘিরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আয়োজন চলতে থাকে। আর শিকাগো হয়ে উঠে এই প্রতিবাদ প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল।

১লা মে এগিয়ে আসতে লাগল। মালিক-বণিক শ্রেণী অবধারিতভাবে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ১৮৭৭ সালে শ্রমিকরা একবার রেলপথ অবরোধ করলে পুলিশ ও ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি তাদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। ঠিক একইভাবে ১লা মে-কে মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রস্তুতি চলতে থাকে। পুলিশ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শিকাগো সরকারকে অস্ত্র সংগ্রহে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। ধর্মঘট আহবানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শিকাগো বাণিজ্যিক ক্লাব ইলিনয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ২০০০ ডলারের মেশিন গান কিনে দেয়। ১লা মে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০০,০০০ শ্রমিক তাদের কাজ ফেলে এদিন রাস্তায় নেমে আসে। শিকাগোতে শ্রমিক ধর্মঘট আহবান করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক কাজ ফেলে শহরের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হয়। অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, মিছিল-মিটিং, ধর্মঘট, বিপ্লবী আন্দোলনের হুমকি সবকিছুই মিলে ১লা মে উত্তাল হয়ে ওঠে। পার্সন্স, জোয়ান মোস্ট, আগস্ট স্পিজ, লুই লিং সহ আরো অনেকেই শ্রমিকদের মাঝে পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে আরো শ্রমিক কাজ ফেলে আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখে। ৩ মে (কারো কারো মতে ৪ মে) ১৮৮৬ সালে সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর হে-মার্কেট বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিকগণ মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হন। আগস্ট স্পিজ জড়ো হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছিলেন। হঠাৎ দূরে দাঁড়ানো পুলিশ দলের কাছে এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে, এতে এক পুলিশ নিহত হয় এবং ১১ জন আহত হয়, পরে আরো ৬ জন মারা যায়। পুলিশ বাহিনীও শ্রমিকদের উপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে যা সাথে সাথেই রায়টের রূপ নেয়। রায়টে ১১ জন শ্রমিক শহীদ হন। পুলিশ হত্যা মামলায় আগস্ট স্পিজসহ ৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর বিচারের রায়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড-দেয়া হলো। কিন্তু এ রায় মেনে নিতে পারেননি শ্রমিক নেতাদের পরিবার। তারা রায়ের প্রতিবাদ করলেন, সমাবেশ করলেন, মিছিল, বক্তৃতা দিলেন। দেশ-বিদেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ কোনো কাজে এলো না এবং শ্রমিক নেতাদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হলো না, বরং আবেদন অগৃহীত হয়ে ফাঁসির রায় অব্যাহত রইল। শ্রমিক নেতাদের দেখার জন্য তাদের পরিবারের সদস্যদেরও কোনো সুযোগ দেয়া হলো না। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুই লিং একদিন পূর্বেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন, অন্য একজনের পনের বছরের কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্বে আগস্ট স্পিজ বলেছিলেন, 'আজ আমাদের এই নিঃশব্দতা, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে।' ২৬শে জুন, ১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্নর

অভিযুক্ত আট জনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা দেন এবং রায়টের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনোই প্রকাশ পায়নি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মে দিবস: শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের 'দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করার' দাবি অফিসিয়াল স্বীকৃতি পায়। শ্রমিক নেতাদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে মে দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের উক্ত গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে "মে দিবস" বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। ১৮৯০ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসে' ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তখন থেকে অনেক দেশে দিনটি শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উদযাপিত হয়ে আসছে। রাশিয়াসহ পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর মে দিবস এক বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। জাতিসংঘে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শাখা হিসাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি লাভ করে এবং সকল দেশে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের তা মেনে চলার আহবান জানায়।

বিশ্বব্যাপী মে দিবস উদযাপন: ১৮৮৯ সালের প্যারিস সম্মেলনে স্বীকৃতির পর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মে দিবস উদযাপন শুরু হয়। ১৮৯০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের হাউড পার্কে বিশাল সমারোহে উদযাপন করা হয় প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস। যুক্তরাষ্ট্রেও প্রথম মে দিবস পালন করা হয় একই বছর। ফ্রান্সে দিবসটি পালন করা হয় শ্রমিকদের বিশাল মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে। রাশিয়ায় প্রথম ১৮৯৬ সালে এবং চীনে ১৯২৪ সালে আন্তর্জাতিক মে দিবস উদযাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরে এই রীতি ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি মহাদেশে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের প্রায় প্রতিটি উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত ছোট বড় সব দেশেই প্রতি বছর পালিত হয় আন্তর্জাতিক মে দিবস।

বাংলাদেশে মে দিবস পালন এবং শ্রমিকদের বাস্তবতা: বাংলাদেশ দক্ষিণ

এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং আইএলও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এই দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা অনেক। শ্রমিক দিবসের প্রেরণা থেকে বাংলাদেশ মোটেও পিছিয়ে নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসন থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে মে দিবস পালিত হয়। ঐ বছর সদ্য স্বাধীন দেশে পয়লা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। তারপর থেকে আজও পয়লা মে সরকারি ছুটির দিন বহাল আছে। এদিন শ্রমিকরা মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালন করে মে দিবস। তারা তাদের পূর্বসূরিদের স্মরণে আয়োজন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। শ্রমিক সংগঠনগুলো মে দিবসে আয়োজন করে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমুখী কর্মসূচির। বাংলাদেশের শ্রমিকরা এদিন তাদের নিয়মিত কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতি পেয়ে থাকে। আনন্দঘন পরিবেশে তারা উদযাপন করে মহান মে দিবস। রাষ্ট্রের সরকারি দল ও বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনও দিনটি পালন করে থাকে। এদিন দেশের সকল প্রচারমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় শ্রমিকদের পক্ষে সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়।

প্রতি বছর মে দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত ইতিহাসকে স্মরণ করে তেমনি স্বপ্ন দেখে তাদের অধিকারের ষোলআনা প্রাপ্তির। বাংলাদেশের শ্রমিকরাও নিঃসন্দেহে এর বাইরে নয়। কিন্তু আজও বাংলাদেশের শ্রমিকদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমিকদের দিকে তাকালে আমরা আজও দেখতে পাই মালিক শ্রেণী কিভাবে তাদেরকে শোষণ করছে। মালিক শ্রেণীর শোষণের ফলে অসহায়ের মতো শ্রমিকদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। এইতো মাত্র ৫ বছর পূর্বে ২০১৩ সনের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সাভারে রানা প্লাজায় শ্রমিকদের ওপর স্মরণকালের ভয়াবহ ভবনধসে প্রায় বার শতাধিক নিরীহ শ্রমিকের করুণ মৃত্যু পুরো জাতিকে শোকাহত করে। ঘটনার পাঁচ বছর পূর্ণ হলেও রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে নিখোঁজ ১০৫ জন শ্রমিকের সন্ধান আজও মিলেনি, এমনকি অনেকের কপালে ক্ষতিপূরণের অর্থও জোটেনি। এর পূর্বে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের গার্মেন্ট কারখানায় আগুন লেগে ১১১ জন শ্রমিক পুড়ে মারা যায়। এর আগে ২০১০ সালে হামিম গার্মেন্টসসহ তিনটি গার্মেন্টসে অনেক শ্রমিকের প্রাণ চলে যায়। এসবের অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে শুধুমাত্র মালিক শ্রেণীর গাফিলতির কারণে। এভাবে প্রায় প্রতি বছর গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোয় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এসব দুর্ঘটনায় অনেক নারী-পুরুষ-শিশু মারা যায়। দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক মারা যায়, তাদের পরিবারের রুটি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারা চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। আর মালিক শ্রেণীরা এ থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। যদি সরকারিভাবে প্রতিটি দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে সঠিক তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচার করা হতো তাহলে এতো দুর্ঘটনা ঘটতো না।

আজকের এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন পাচ্ছে না। যেখানে শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের জন্য। যেখানে বাংলাদেশের গার্মেন্টগুলোতে এখনও ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। বিনিময়ে বেতন দেয়া হচ্ছে নামমাত্র। যা দিয়ে একজন মানুষ চলাফেরা করা কষ্টকর। আজকে শ্রমিকদের কোন নিরাপত্তা নেই।

মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে তারা পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। এ নিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তা ছাড়া আমাদের দেশে শ্রমিকদের একটি বড় অংশ নারী ও শিশু। এসব নারী ও শিশু বিভিন্ন কল-কারখানা, বিশেষ করে গার্মেন্ট শিল্পে তারা বেশি কাজ করে থাকে। অথচ আমাদের সংবিধানে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তথাপি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকেই আবার জীবন ঝুঁকির মধ্যেও পড়ে যাচ্ছে। মারাও যাচ্ছে অনেক শ্রমিক। বাংলাদেশের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার কারণে তারা শারীরিক-মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা হচ্ছে বঞ্চিত। এসব শিশু স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে এক সময় অপরাধ জগতে পা বাড়ায়।

আসলে আমরা শ্রম বা শ্রমিকের মর্যাদা বুঝেও বুঝতে চাই না। একজন মানুষের জীবনধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এসবই একজন শ্রমিকের প্রাপ্য। আর এটাই হচ্ছে শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা। একুশ শতকে এসে শ্রমিকরা এর কতটুকু মর্যাদা বা অধিকার ভোগ করছে? বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। কারণ শ্রমিকরা এ দেশের সম্পদ। তাদের কারণেই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। এ কারণে তাদের অবহেলার চোখে দেখার কোন সুযোগ নেই। তাদের কাজের ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মহান মে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমরা শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকারের কথা বলি কিন্তু বাস্তবে মজদুর মেহনতি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শাসক, প্রশাসক ও মালিক গোষ্ঠী আদৌ আন্তরিক হতে পারিনি। যদিও সময়ের ব্যবধানে শ্রমজীবী মানুষের যান্ত্রিক বিপ্লবের কারণে কাজের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পরিবর্তন আসেনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার অদ্যাবধি পর্যন্ত অধরাই থেকে গেল।

পোশাক শিল্পের বিকাশে এই দেশে নারীর

“বাংলাদেশের গার্মেন্টগুলোতে এখনও ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১২ ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। বিনিময়ে বেতন দেয়া হচ্ছে নামমাত্র। যা দিয়ে একজন মানুষ চলাফেরা করা কষ্টকর। আজকে শ্রমিকদের কোন নিরাপত্তা নেই। মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে তারা পেটের দায়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে উৎপাদনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। এ নিয়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তা ছাড়া আমাদের দেশে শ্রমিকদের একটি বড় অংশ নারী ও শিশু। এসব নারী ও শিশু বিভিন্ন কল-কারখানা, বিশেষ করে গার্মেন্ট শিল্পে তারা বেশি কাজ করে থাকে। অথচ আমাদের সংবিধানে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। তথাপি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করছে। অনেকেই আবার জীবন ঝুঁকির মধ্যেও পড়ে যাচ্ছে। মারাও যাচ্ছে অনেক শ্রমিক। বাংলাদেশের শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার কারণে তারা শারীরিক-মানসিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা হচ্ছে বঞ্চিত। এসব শিশু স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে এক সময় অপরাধ জগতে পা বাড়ায়।”

শ্রমিকের অবদান অনেক বেশি। কিন্তু যেই নারী শ্রমিকের অবদানে দেশের জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেই নারী শ্রমিকের চলমান জীবনযাপন বড়ই দুর্বিষহ। বেতনের সাথে যাদের জীবনযাত্রার ব্যয় খাপ খায় না তারাই হলেন গার্মেন্টস শ্রমিক।

বাংলাদেশে কাজের ক্ষেত্রে পোশাক শ্রমিকের পর নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। এসব ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় যাদের রক্ত ও ঘাম মিশে আছে তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য পাওনা অনেক সময় পায় না। শ্রম দিয়ে যারা শ্রমের মূল্য পায় না তারাই জানে জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার লড়াই কত কষ্টের? শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আলএলও) এবং দেশের শ্রম আইনে সংবিধান অনুসারে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার যেন কিতাবে আছে গোয়ালে নেই! বরাবরই এই দেশের দিনমজুর শ্রেণীর মেহনতি মানুষ বঞ্চিত ও শোষিত।

শুধু গার্মেন্টস শিল্পে নয় ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন মিল, ফ্যাক্টরি ও ব্রিকফিল্ড শ্রমিকের পর সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার হয় ঘরের গৃহকর্মীরা। বাংলাদেশে গৃহকর্মীর গায় গরম ইস্ত্রির সেঁকা দিয়ে পিট ঝলসিয়ে দেয়া এবং নানাবিধ নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুধু তাই নয় গৃহ কর্মীদের উপর বর্বর নির্যাতনের পাশাপাশি খুন ধর্ষণও করা হচ্ছে। মে দিবসে যেভাবে আমরা শ্রমিক অধিকার নিয়ে কথা বলি তার তুলনায় বাস্তবে শ্রমিকের অধিকার ও অর্জন অনেক সীমিত।

মে দিবসের তাৎপর্য : বর্তমান শ্রেণি বৈষম্যহীন সভ্য সমাজের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে মূলত ১৮৮৬ সালের সেই শ্রম আন্দোলন। মে দিবসের জন্ম বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সারা পৃথিবীজুড়ে শ্রমিক আন্দোলন ও মুক্তির সংগ্রামের মহান ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মে দিবস। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী অমানবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার মন্ত্র বিশ্ববাসীকে শিখিয়ে দিয়েছে এই দিবস। এজন্য মে দিবসকে বলা যায় পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে শ্রমিকদের মুক্তি লাভের সনদ। পুঁজিবাদীরা এক সময় শ্রমিকদেরকে নিজেদের দাস হিসেবে ব্যবহার করার হীন প্রবণতা প্রকাশ করতো। শ্রম বিপ্লবের পর মে দিবস যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তখন এই দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটলো। মে দিবসের কারণে শ্রমিক শ্রেণির চিন্তা ও চেতনায় বৈপ্লবিক উন্নতির উদয় হয়েছে। শ্রমজীবীরা এর মাধ্যমে এক নতুন জীবন লাভ করলো, যা তাদেরকে কিছুটা হলেও স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ করে দিল। তাদের সংগ্রামী চেতনার আলোয় আলোকিত হয়েছে পুরো মানবসমাজ। শ্রমিক শ্রেণির সামনে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দিগন্ত। শ্রমিক সংহতি ও ঐক্য হয়েছে আরো বেশি দৃঢ় ও মজবুত। মে দিবস সমাজ থেকে

দূর করতে সক্ষম হয়েছে কলুষিত ও বিভীষিকাময় অন্ধকার।

মে দিবসের মূল্যায়ন : শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের কিছু অধিকার অর্জন করলেও সকল দিক থেকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। মে দিবস ঘটা করে পালন হলেও শ্রমিকরা আজও অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার। আজও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি। কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম হয়তো বা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু থামেনি শ্রমিক নিপীড়ন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়নি শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রমের মূল্য। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে আমরা সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারি। বেতন বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতন আদায়ের নিমিত্তে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টে নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। গার্মেন্ট শ্রমিকরা দাবি আদায়ে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ করে যাচ্ছে। মালিক পক্ষ হর হামেশাই শ্রমিকদেরকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলন ঠেকানোর জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে শ্রমিক নেতা-নেত্রীদেরকে গ্রেফতার করানো হচ্ছে। গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা আমিনুলকে দীর্ঘদিন গুম করে রেখে পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই এটি দৃঢ়তার সাথে বলা যায় আজও দুনিয়ার কোথাও শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি এবং তাদের বাঁচার উন্নত পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সংগঠন হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি লাভ করে। আইএলও শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ পর্যন্ত ১৮৩টি কনভেনশন প্রণয়ন করে। এর মধ্যে ৮টি কোর কনভেনশনসহ ৩৩টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা কতটুকু অধিকার পাচ্ছে, শ্রমিকদের কতটুকু কল্যাণ সাধিত হয়েছে আজ এই সময়ে তা কঠিন এক প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ লেবার ফোর্সের জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মহিলা শ্রমিক। মে দিবস যায়, মে দিবস আসে। কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্য যেন আর খোলে না।

“শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা তাদের কিছু অধিকার অর্জন করলেও সকল দিক থেকে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। মে দিবস ঘটা করে পালন হলেও শ্রমিকরা আজও অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার। আজও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত মজুরি নিশ্চিত করতে পারেনি। কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম হয়তো বা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু থামেনি শ্রমিক নিপীড়ন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়নি শ্রমিকের প্রকৃত মর্যাদা ও শ্রমের মূল্য। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অহরহ শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে আমরা সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারি। বেতন বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতন আদায়ের নিমিত্তে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টে নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। গার্মেন্ট শ্রমিকরা দাবি আদায়ে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ করে যাচ্ছে। মালিক পক্ষ হর হামেশাই শ্রমিকদেরকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলন ঠেকানোর জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে শ্রমিক নেতা-নেত্রীদেরকে গ্রেফতার করানো হচ্ছে। গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা আমিনুলকে দীর্ঘদিন গুম করে রেখে পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই এটি দৃঢ়তার সাথে বলা যায় আজও দুনিয়ার কোথাও শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি এবং তাদের বাঁচার উন্নত পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।”

শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বদ্ধপরিকর। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদমই (আ) শুধু নন; সকল নবী-রাসূল এমনকি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (সা) শ্রমিকের অধিকার ও শ্রম আইনের পথপ্রদর্শক।

মিশকাত শরিফে মহানবী (সা.) শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, ‘শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের মজুরি পরিশোধ করে দাও’।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের অধীন লোকেরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও। তাকে তাই পরিধান করতে দাও যা তুমি নিজে পরিধান কর’। (বুখারি)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: ‘কেউ তার অধীনস্থকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কিয়ামতের বিচারের দিনে তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে’। (তাবরানি)

মহানবী (সা) শ্রমিককে আপনজনের সাথে তুলনা করে বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে যেমন ব্যবহার কর, তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করবে।’

একই কথা মহানবী (সা) আরেক হাদীসে উল্লেখ করেছেন এভাবে, ‘তোমরা অধীনস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না, তাদেরও তোমাদের মতো একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না।’ (বুখারি)

শ্রমিকদের শক্তি-সামর্থ্য ও মানবিক অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে মহানবী (সা) বলেছেন, ‘মজুরদের সাধ্যের অতীত কোন কাজ করতে তাদের বাধ্য করবে না। অগত্যা যদি তা করাতে হয় তবে নিজে সাহায্য কর।’ (বুখারি)

উমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেন তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নিবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও পূর্ণ লেখা হবে।

ইবনে যুবাইর (রা) বলেন নবী করীম (সা) চাকরের সাথে একত্রে বসে খেতে তাগিদ দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা) চাকর-বাকরকে আমি কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলেন। সে পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ রইলেন। চতুর্থবার বলার পর বললেন দৈনিক সত্তর বার ক্ষমা করবে। (আবু দাউদ)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন, 'তোমাদের খাদেম যদি তোমাদের খাদ্য প্রস্তুত করে এবং তা নিয়ে যদি তোমার কাছে আসে যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তখন তাকে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয় তবে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (মুসলিম)

মালিকের প্রতি শ্রমিককে তার অধিকার নিশ্চিত না করার পরিণাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী (সা) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কঠিন অভিযোগ উপস্থাপন করব- যে ব্যক্তি আমার কাউকেও কিছু দান করার ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে যে তার মূল্য আদায় করল এবং যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কাজে নিযুক্ত করে পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিলো, কিন্তু তার মজুরি দিলো না-ওরাই সেই তিনজন।' (মিশকাত)

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, অধীনস্থদের সাথে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (ইবনে মাযাহ)

এভাবে ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার যে গ্যারান্টি দিয়েছে, তা দুনিয়ার আর কোনো মতবাদ বা দর্শন দেয়নি বা দিতে পারেনি। আধুনিক বিশ্বের পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্র দর্শনের কোনটাই শ্রমিকের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদার ন্যূনতম সমাধান দিতে পারেনি। তারা মুখে শ্রমিক অধিকারের কথা বললেও বাস্তবে শ্রমিকদেরকে পুঁজি করে রাজনীতি করাসহ অগাধ অর্থ বৈভবের মালিক হয়েছে। ফলে এখনও শ্রমিক-মজুররা নিষ্পেষিত হচ্ছে। মালিকের অসদাচরণ, কম শ্রমমূল্য প্রদান, অনুপযুক্ত কর্মপরিবেশ প্রদানসহ নানা বৈষম্য শ্রমিকের দুর্দশা ও মানবেতর জীবনযাপনের কারণ হয়ে আছে। পরিশেষে মে দিবসের প্রাক্কালে আমরা বলতে

চাই, নানা আয়োজনে প্রতি বছর শ্রমিক দিবস পালন করার মধ্যে শ্রমিকের প্রকৃত কোনো মুক্তি নেই। যে অধিকারের জন্য শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন শিকাগোর রাজপথে, তা বাস্তবে এখনও অর্জিত হয়নি। আজও শ্রমিকেরা পায়নি তাদের কাজের উন্নত পরিবেশ, পায়নি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মতো মজুরি কাঠামো এবং স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত জীবনের নিশ্চয়তা। মহান মে দিবস কে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজের পক্ষ থেকে উত্থাপিত নিম্নোক্ত দাবিগুলোকে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

১. ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দেশের শ্রমনীতি ঢেলে সাজাতে হবে

২. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান করতে হবে

৩. সকল বন্ধ কল-কারখানা চালু করতে হবে

৪. শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মজুরি অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে

৫. জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

৬. গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা চালু করতে হবে

৭. শ্রমিকদের ন্যায়বিচার ত্বরান্বিত করার স্বার্থে শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে

৮. শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাসস্থান, রেশনিং, চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

৯. কল-কারখানায় ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

১০. আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে

১১. শ্রমিকদের পেশাগত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে

১২. নারী ও পুরুষের বেতন-ভাতার সমতা বিধান করতে হবে

১৩. কল-কারখানায় শ্রম আইন অনুযায়ী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিশু যত্নাগার স্থাপন করতে হবে

১৪. শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে

১৫. আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করে সকল পেশায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের প্রতি মালিকের সহনশীল মনোভাব থাকতে হবে।

এছাড়া শ্রম শিল্পের মালিকদেরকে শ্রমিকদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আলোকে তাদেরকে কাজ দিতে হবে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য তাদের মজুরি সেভাবে নির্ধারণ করতে হবে। মালিককে অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, তার নিজের স্বজনরা যে রকম জীবনযাপন করবে, তার অধীনস্থ শ্রমিকরাও সে রকম জীবনের নিশ্চয়তা পাবে।

মূলত ইসলামী শ্রমনীতি চালু এবং সৎ ও ন্যায়বান লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এলে তারাই শ্রমিকের অধিকার আদায় ও রক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাছাড়া কোনভাবেই শ্রমিক সমাজের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা আদায় সম্ভব হবে না। সুতরাং শ্রমিক সমাজসহ দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীকে ইসলামী শ্রমনীতি চালু ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে সৎ ও ন্যায়বান লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আনয়নে প্রচেষ্টা চালানো জরুরি।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

ইসলামে শ্রমিকের প্রতি আচরণ ও অধিকার

ড. মোবারক হোসাইন

ইসলাম কালজয়ী ও শাশ্বত এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। ইসলাম মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ, মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার পুরো নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলাম ন্যায়সঙ্গত শ্রমপ্রদান করা ও শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষ তা পায় যা সে চেষ্টা করে। আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে। অতঃপর তাকে দেয়া হবে উত্তম প্রতিদান।" (সূরা নাজম : ৩৯-৪১) ইসলাম শ্রমজীবী মানুষকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে। শ্রমিকদের অধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছে। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আরবে তথা গোটা বিশ্বেই যখন অরাজকতার অন্ধকার বিরাজিত ছিল, তখনই সত্য, ন্যায় ও সাম্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে বিশ্বমানবতার পরম সুহৃদ হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল এই কালজয়ী ইসলাম ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আদর্শ মানবসমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। যেখানে প্রতিটি মানুষের শুধু নয় বরং প্রতিটি সৃষ্টির অধিকার স্বীকৃত হয়ে আছে। ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা যথাযথভাবে স্বীকৃত। মুহাম্মদ (সা:)-এর আদর্শই শ্রমিকদের একমাত্র মুক্তির পথ। ইবনে মাজাহ হাদিসে এসেছে- রাসূল (সা:) ওফাতকালীন সময়ে যে উপদেশ প্রদান করেছেন তা হলো, তোমরা নামাজ এবং অধীনদের ব্যাপারে সাবধান থেকো। এখানে অধীন বলতে কাজের লোক বা শ্রমিক, যারা কারও অধীনে শ্রমের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। রাসূল (সা:) আরও বলেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার অধীনস্থদের নিকট উত্তম।"

শ্রমের পরিচয়:

শ্রম শব্দের আভিধানিক অর্থ মেহনত, দৈহিক খাটুনি, শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি। অর্থনীতির পরিভাষায়, "পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।" অধ্যাপক মার্শাল শ্রমের সংজ্ঞায় বলেন, Any exertion of mind or of body undergone partly or of wholly with a view to some good other then pleasure derived directly form the work." অর্থাৎ "মানসিক অথবা শারীরিক যে কোনো প্রকার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ পরিশ্রম যা আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের উপকার সরাসরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে শ্রম বলে।" ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রমের পরিচয় বলা যায়, "মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সকল কায়িক ও মানসিক শক্তিকে শ্রম বলে।" বাহ্যত এ শ্রম উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হোক কিংবা পারিশ্রমিক না থাকুক অথবা সে পারিশ্রমিক নগদ অর্থ হউক কিংবা অন্য কিছু এবং শ্রমের পার্থিব মূল্য না থাকলেও পারলৌকিক মূল্য থাকবে।

শ্রমের প্রকারভেদ:

ইসলামে সাধারণত শ্রমকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১. শারীরিক শ্রম: শারীরিক শ্রম হলো পুঁজিবিহীন জীবিকা অর্জনের জন্য দৈহিক পরিশ্রম। যেমন- রিক্সাচালক, দিনমজুরদের দৈনন্দিন শ্রম।

২. শৈল্পিক শ্রম: শৈল্পিক শ্রম বলতে যে কাজে শিল্প ও কৌশলবিদ্যাকে অধিক পরিমাণে খাটানো হয়। যেমন- অঙ্কন, হস্তশিল্প, স্থাপনা ইত্যাদি।

৩. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম: বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সকল পুঁজিহীন শ্রমকে বুঝায়, যেগুলোতে দেহের চেয়ে মস্তিষ্ককে বেশি খাটানো হয়। যেমন- শিক্ষকতা, ডাক্তারি, আইন পেশা ইত্যাদি।

শ্রমিকের পরিচয়:

শ্রমিকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Labour আর আরবিতে বলা হয় আমেল। সাধারণ অর্থে যারা পরিশ্রম করে তাদেরকেই শ্রমিক বলা হয়। প্রচলিত অর্থে সমাজে বা রাষ্ট্রে যারা অন্যের অধীনে অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম করে তাদেরকে শ্রমিক বলা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক মানুষকে তার গোলামি করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর বিধান মতো কাজ করার নামই আমল। এক অর্থে প্রতিটি মুসলমান শ্রমিক হিসাবে শ্রম দিয়ে থাকেন। একজন প্রেসিডেন্টও শ্রম দিয়ে থাকেন, আবার একজন দিনমজুরও শ্রম দিয়ে থাকেন- এ অর্থে সবাই শ্রমিক। সাধারণত দৃষ্টিতে শ্রমিক বলতে কারখানায় কায়িক শ্রমে নিয়োজিত কেউ, রিকশা চালক, কুলি-মজুর সহ হাজারো পেশায় নিয়োজিত কোটি কোটি শ্রমিক যারা মূলত কায়িক শ্রমে নিয়োজিত। কিন্তু শ্রম আইনে সবাই শ্রমিক কিনা কিংবা শ্রম আইনের আওতায় সবাই পড়েন কিনা সেটি বিবেচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশের শ্রম

আইনের ২(৬৫) ধারায় বলা হয়েছে 'শ্রমিক' অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদার-এর (যে নামেই অভিহিত হউক না কেন) মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক (তদারকি কর্মকর্তা) বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

মালিকের পরিচয়:

অর্থনীতির পরিভাষায়, যারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় কর্মকর্তার অধীনে শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন, তারাই শ্রমিক-শ্রমজীবী মানুষ। আর যারা শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করেন, তাদের নিকট থেকে যথাযথভাবে কাজ আদায় করেন এবং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন-ভাতা প্রদান করেন, তারাই মালিক।

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও আচরণ:

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিককে একজন অর্থনৈতিক জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তার কাছ থেকে বাড়তি উৎপাদনের মাধ্যমে কিভাবে মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করা যায় সেদিকেই দৃষ্টি থাকে মালিকের। আমাদের শ্রম আইনে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সমতুল্য। ফলে শ্রমিক-মালিকের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সৎ গুণাবলির সমাবেশ না হয়ে সৃষ্টি হয় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা। অথচ ইসলাম ভাইয়ের সম্পর্ক উল্লেখ করে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কের ভিত্তি ভ্রাতৃত্বের ওপর রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের বেতন-ভাতা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর বাণীসমূহ দ্বারা বৈপ্লবিক ও মানবিক শ্রমনীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। মালিকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সে শ্রমিকের শ্রম টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সে শ্রমিককে কিনে নেয়নি যে, সে ইচ্ছামত শ্রমিক থেকে শ্রম নেবে। এ জন্য সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলাম মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের প্রতি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, "সর্বোত্তম শ্রমিক

"আমাদের শ্রম আইনে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সমতুল্য। ফলে শ্রমিক-মালিকের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সৎ গুণাবলির সমাবেশ না হয়ে সৃষ্টি হয় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা। অথচ ইসলাম ভাইয়ের সম্পর্ক উল্লেখ করে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কের ভিত্তি ভ্রাতৃত্বের ওপর রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের বেতন-ভাতা ও মৌলিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর বাণীসমূহ দ্বারা বৈপ্লবিক ও মানবিক শ্রমনীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।"

সেই যে শক্তিশালী ও আমানতদার।" (সূরা কাসাস : ২৬) অপর আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "আর মনে রাখবে কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো একথা বলবে না যে, আমি কাল এ কাজ করব।" (সূরা কাহাফ : ২৩) মালিক ও শ্রমিকের প্রতি আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্তাআলা বলেন, 'ওয়াদা পূর্ণ কর! ওয়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।" (সূরা ইসরাহ্ : ৩৪) নবী (সা:) বলেন, 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই'। মালিকের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা, অপচয় না করা, আত্মসাৎ না করা, সঠিক হিসাব পেশ করা একজন শ্রমিকের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা:) বলেন, 'কাউকে কোন ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হলে সে তার নিজের কাজ যত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব তদ্রূপ না করলে কিয়ামতের দিন তাকে উল্টা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। তিনি আরো বলেন, 'কারো ওপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে সে যদি এক টুকরো সুতা বা তার চেয়েও কোন ক্ষুদ্র জিনিস খেয়ানত করে তবে কিয়ামতের দিন খেয়ানতের বোঝা মাথায় করে সে উত্থিত হবে।' আল্লাহপাক বলেন, "এদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে যারা তাৎফিক অর্থাৎ মাপে কম-বেশ করে। নিজের হক নেবার সময় পুরোপুরি আদায় করে নেয় কিন্তু অন্যকে মেপে দিতে গেলেই কম দেয়।" (সূরা মুতাফ্ফিফীন : ১-৩) তাৎফিক অর্থে ঐ সমস্ত মজদুরকেও বলে যারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি উসুল করেও কাজে গাফেলতি করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর আদর্শে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা সকলেই আল্লাহ্তাআলার বান্দা ও পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, "তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ যে ভাইকে যে ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন, তাকে তাই খাওয়াতে হবে, যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরতে দিতে হবে যা সে নিজে পরিধান করে।" (সহিহুল বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, "শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।" (সহিহুল বুখারী ও মুসলিম) মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্মচারীদের কর্তব্য হলো শ্রমিকদের সাথে মিলেমিশে থাকা, কথাবার্তা, উঠা-বসার ক্ষেত্রে ইসলামী ভ্রাতৃত্বসুলভ ব্যবহার ও আচার-আচরণ অবলম্বন করা, মৃত্যু, রোগ-শোক ও অন্যান্য ঘটনা-দুর্ঘটনাকালে নিজেরা উপস্থিত থেকে সহানুভূতি ও সহৃদয় আচরণ গ্রহণ করা।

বর্তমানে মালিকের প্রতি শ্রমিক পোষণ করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং শ্রমিকের প্রতি মালিক পোষণ করে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। ইসলামের ওপর উভয়ে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় আজকের এই পরিণতি। অথচ ইসলাম উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা বলেছিল। একজন শ্রমিক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শুধু ন্যায্য পারিশ্রমিকই নয় বরং সাথে সাথে লাভ করতে পারতো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ। রাসূল (সা:) বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। তাদের একজন, যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং সঙ্গে আল্লাহর হকও।' তিনি আরো বলেন, 'যে অধীনস্থ খাদেম আল্লাহ ও তার মালিকের অনুগত থেকে দায়িত্ব পালন করে তাকে মালিকের সত্তর বছর

পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে।'

ইসলামে সকল পেশাই মর্যাদাপূর্ণ:

মহানবী (সা:)-এর আগমনের পর মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষের পরিবর্তে এক সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বৈষম্যের সকল দেয়াল ভেঙে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, মালিক-শ্রমিক, আরবীয়-অনারবীয় সকলেই সমান ও পরস্পরের ভাই। সর্বপ্রকার জুলুমের তিনি অবসান ঘটান। তিনি আরো বলেন, 'যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে অন্যরা নিরাপদ নয় সে মুমিন নয়'। ইসলামে কোন কাজকেই ঘৃণা করেনি। শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনকে মহানবী শ্রেষ্ঠতম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, 'শ্রমজীবীর উপার্জনই শ্রেষ্ঠতর যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর'? তিনি জবাব দিলেন, 'নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন'। ইসলাম সকল বৈধ পেশাকে উৎসাহিত করে এবং সকল পেশার মানুষকে সমান সম্মান করে। সম্পদ, বংশ ও পেশার কারণে মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিরূপিত হয় নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে। (সূরা হুজুরাত : ১৩) কাজেই যে কোন পেশার লোক সম্মানের পাত্র। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'তোমাদের কারোর নিজ পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে এনে বিক্রি করা কারো কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম। তাকে (প্রার্থীকে) সে কিছু দিক বা না দিক।' (বুখারি : ২/৭৩০) ভিক্ষার প্রতি নিরুৎসাহিত করে ভিক্ষার হাতগুলোকে শ্রমিকের হাতে রূপান্তর করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা:)। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে সে কখনো ভিক্ষা করবে না, তার জান্নাতের ব্যাপারে আমি দায়িত্বগ্রহণ করব।' (আবু দাউদ : ২/৪২৭) উপার্জনের জন্য শ্রমে লিপ্ত থাকাকে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বলে উল্লেখ করেছেন। এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে সাহাবায়ে কেরাম লোকটির শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা দেখে বলতে লাগলেন, এই লোকটি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকত! রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'লোকটি যদি তার ছোট ছোট সন্তান অথবা তার বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য উপার্জন কিংবা নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে আল্লাহর পথেই রয়েছে।' (হাইসামি : ৪/৩২৫) শ্রমিকের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণাও করেছেন তিনি। একটি হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যা যাপন করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।' মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাঁতী কাপড় বুনেন, কুমার পাতিল বানান, নৌকার মাঝি মানুষ পারাপার করেন। এসব কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না কাউকে অবশ্যই কাজগুলো করতে হবে। কেউ যদি এসব কাজ করতে এগিয়ে না আসতেন, তা হলে মানবজীবন অচল হয়ে পড়ত। কোনো কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব কাজ করেন, তারাও হীন বা ঘৃণ্য নন। ইসলামী আদর্শের কাছে মনিব-গোলাম, বড়-ছোট, আমির-গরিব– সবাই সমান। ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমাজপতি, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদের আলাদাভাবে মর্যাদার একক অধিকারী হওয়ার সুযোগ নেই। অধীনস্থরা ও ইনসাফের দাবি

> **'Behavior is a way of action'** *অর্থাৎ মানুষ মনে মনে যা চিন্তা করে এবং যেসব কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তাকেই আচরণ বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভাল-মন্দ পরিচয় নির্ভর করে সুন্দর আচরণের উপর। শ্রমিকদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে কাজের ভাল পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলাম সাধ্যানুযায়ী ও রুচি অনুযায়ী কাজ করার জন্য মানুষকে জন্মগত অধিকার দিয়েছে।*
>
> *হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, "অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবশে করবে না।" (সুনানু ইবন মাজাহ্)।*

করার অধিকার রাখে। একমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের সর্বাধিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম, অন্য কোনো মানবরচিত মতবাদ বা আদর্শ ইসলামের মতো শ্রমিকদের অধিকার দিতে পারে না। ইসলামের দাবি অনুযায়ী, গোলামের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে এবং তাদের কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না।

শ্রমিকদের সাথে আচরণ:

'মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব। তার প্রধান দুটি সত্তা রয়েছে– একটি বাহ্যিক ও অন্যটি অন্তর্গত। শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে তার এই দুটি সত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে থাকে। এ দুটি একটি অপরটির পরিপূরক হলেও অন্তর্গত সত্তাটি সমাজের মানুষের ভালোমন্দ পরিচয় নির্ভর করে প্রধানত তার বাহ্যিক সত্তার ওপর। আর এই বাহ্যিক স্তরটি প্রকাশিত হয় অন্যের প্রতি তার আচরণ ও সৌজন্য প্রকাশের মাধ্যমে। কথায় আছ, "Courtesy pays a lot. but costs nothing". সাধারণত মানুষ তার কার্যাবলি সম্পাদনের সময় যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তাকেই আমরা আচরণ বলে থাকি। অর্থাৎ কাজের দ্বারা মানুষের আচরণ প্রকাশ পায়। তাই বলা যায় 'Behavior is a way of action' অর্থাৎ আচরণ হলো কার্যের একটি পন্থা বা উপায়। মানুষ মনে মনে যা চিন্তা করে এবং যেসব কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তাকেই আচরণ বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভাল-মন্দ পরিচয় নির্ভর করে সুন্দর আচরণের উপর। শ্রমিকদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে কাজের ভাল পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলাম সাধ্যানুযায়ী ও রুচি অনুযায়ী কাজ করার জন্য মানুষকে জন্মগত অধিকার দিয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, "অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবশে করবে না।" (সুনানু ইবন মাজাহ্)। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) মালিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কর্মচারী, শ্রমিক ও অধীনস্থদের সাথে সন্তান-সন্ততির ন্যায় আচরণ করে এবং তাদের মান-সম্মানের কথা স্মরণ রাখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, "তাদের এভাবে সম্মান করবে যেভাবে নিজের সন্তানদের কারো এবং তাদেরকে সে খাবার দিবে যা তোমরা নিজেরা খাও।" (সুনানু ইবন মাজাহ্)। নবী (সা:) আরো বলেন, 'তোমরা অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং

> নবী (সা:) আরো বলেন, 'তোমরা অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন কষ্ট দিবে না। তোমরা কি জান না, তোমাদের ন্যায় তাদেরও একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্ট বোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না।'
> রাসূল (সা:) এরশাদ করেন, তোমাদের চাকর-চাকরানি ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেন তার ওপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারি ও মুসলিম)

তাদেরকে কোন কষ্ট দিবে না। তোমরা কি জান না, তোমাদের ন্যায় তাদেরও একটি হৃদয় আছে। ব্যথা দানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্ট বোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না।'
রাসূল (সা:) এরশাদ করেন, তোমাদের চাকর-চাকরানি ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদের আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেন তার ওপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারি ও মুসলিম) পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, আমি তোমার উপর কোনোরূপ কঠোরতা করতে চাই না, কোনো কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ তোমার ওপর চাপাতেও চাই না, আল্লাহ চাহে তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। (সূরা কাসাস : ২৭)
সু-আচরণ সম্পর্কে জনৈক ফ্রায়া স্টার্ক বলেন, "সু-আচার আচরণ অংকশাস্ত্রের শূন্যের মতো, আপাতদৃষ্টিতে এর গুরুত্ব ততোটা বোঝা যায় না, কিন্তু সবকিছুর সাথে এর সংমিশ্রণ বিরাট মূল্য পরিবর্ধন করে।" বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কবরিহ খবরিহ মানুষের আচরণ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রচার করেছেন। তাঁর মান অনুসারে তত্ত্বটি ক. খবরিহ মডেল নামে পরিচিত। তিনি এখানে ব্যক্তির আচরণকে ব্যক্তির কার্যকলাপের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মূলত মানুষের আচরণ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি তার পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় যা তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। ক. খবরিহ একটি গাণিতিক ফাংশনের মাধ্যমে তার মডেলটি উপস্থাপন করেছেন। মডেলটি - B=F (P*E)| যেখানে, B= Behavior, F= Function, P= Person, E= Environment
মহানবী (সা:) শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য এক ঐতিহাসিক ভাষণে যে অনুপম শ্রমনীতি দিয়ে গেছেন- "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, গোলামদের সাথে ভাল আচরণ করবে এবং তাদের কোন কষ্ট দিবে না। তোমরা কি জান না, তাদের একটি অন্তর আছে যা কষ্ট পেলে ব্যথা পায় এবং আরাম পেলে আনন্দিত হয়। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা তাদেরকে হীন মনে কর এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর না! এটা কি জাহিলিয়াতের যুগের মানসিকতা নয়। অবশ্যই এটা জুলুম এবং বে-ইনসাফি।"

শ্রমের গুরুত্ব:

শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক বিষয়। আর তা হলো, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলগণের প্রায় সবাই প্রত্যক্ষভাবে এই শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। মুসনাদে আহমাদ শরিফের মতে, সব নবী-রাসূলই মেষ চরিয়েছেন; এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা:) নিজেও মেষ চরাতেন। "আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধীনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা আয-যুখরুফ : ৩২) প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ-তাআলা মানুষকে একে অপরের উপর মর্যাদা, বুদ্ধি-জ্ঞানে উন্নীত করে মানুষের মাঝে এই পার্থক্য ও তফাৎ এই জন্য রেখেছেন যে, যাতে বেশি মালের অধিকারী ব্যক্তি স্বল্প মালের অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে, উচ্চ পদের মালিক তার চাইতে নিম্ন পদের মালিকের কাছ থেকে এবং অনেক বেশি জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক তার চাইতে কম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিকের কাছ থেকে কাজ নিতে পারে। মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ এই কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বজাহানের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যথা সকলেই যদি ধন-মালে, মান-সম্মানে, জ্ঞান-গরিমায় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্যান্য পার্থিব উপায়-উপকরণে সমান হত, তবে কেউ কারো কাজ করার জন্য প্রস্তুত হত না। মানবিক সমস্ত প্রয়োজন পূরণ ও ভারসাম্যের কারণে মালিক-শ্রমিক শ্রেণি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক শ্রেণি না থাকলে ছোট মানের ও তুচ্ছ মনে করা হয় এমন কাজও কেউ করত না। মহান আল্লাহ প্রত্যেককে পার্থক্য ও তফাতের মাঝে রেখেছেন এবং যার কারণে প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষের মুখাপেক্ষী হয়।
রাসূল (সা:) বলেছেন, 'যে কোন মজুরকে খাটিয়ে নিজের পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু তার মজুরি দেয় না কিয়ামতের দিন আমি তার দুশমন হব। আর আমি যার দুশমন হব তাকে আমি লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত করেই ছাড়বো। মালিককে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে, 'তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'। ইসলাম মালিকদেরকে শ্রমিকের সমস্যা বিবেচনার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর বান্দাহ, প্রতিনিধি ও বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতে বলে। হযরত (সা:) বলেন, 'মজুর-চাকরদের অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। তাদের অপরাধ প্রত্যেক দিন সত্তর বার হলেও ক্ষমা করে দিও'। শ্রমিকদের প্রতি মালিকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের কোন ভৃত্য তোমাদের জন্য যখন খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, তখন তাকে হাতে ধরে খেতে বসাও। সে যদি অস্বীকার করে তবে দু' এক মুঠো খাদ্য তাকে অবশ্যই দিবে।'
মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত।

সব ধরনের শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম–সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং রিযিক অন্বেষণ কর।" (সূরা জুমা : ১০) ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মহানবী (সা:) বলেছেন, "ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি অর্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।" (বায়হাকী) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তিনি তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক থেকে আহার কর।" (সূরা মুলক : ১৫) শ্রম ও শ্রমিকের ব্যাপারে মহানবীর (সা:) সবচেয়ে তাৎপর্যমন্ডিত ঘোষণাটি হলো- আল কাসিবু হাবিবুল্লাহ অর্থাৎ শ্রমিক হচ্ছে মহান আল্লাহর বন্ধু। পবিত্র কোরআনে মানুষকে চিত্রিত করা হয়েছে শ্রমের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দিয়ে। ইরশাদ হচ্ছে- লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ অর্থাৎ "সুনিশ্চিতভাবে মানুষকে আমি শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা বালাদ : ৪) কুরআন-হাদিস, ইসলামের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, নবী-রাসূলগণ শ্রমিকদের কত মর্যাদা দিয়েছেন। ইসলামের সব নবী ছাগল চরিয়ে নিজে শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মালিক হযরত শোয়াইব (আ:) তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্রমিক নবী মূসাকে (আ:) জামাই বানিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা:) শ্রমিক যায়েদ (রা:)-এর কাছে আপন ফুফাতো বোন জয়নবের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বনবী (সা:) যায়েদকে (রা:) মুতারের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন বানানো হয়েছিল শ্রমিক হযরত বিলালকে (রা:)। মক্কা বিজয় করে কাবা ঘরে প্রথম প্রবেশের সময় মহানবী (সা:) শ্রমিক বেলাল (রা:) ও শ্রমিক খাব্বাবকে (রা:) সাথে রেখে ছিলেন। নবীজী কখনো নিজ খাদেম আনাসকে (রা:) ধমক দেননি এবং কখনো কোনো প্রকার কটুবাক্য ও কৈফিয়ত তলব করেননি।

রাসূল (সা:) বলেছেন, "তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও, তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও, যা তুমি নিজে পরিধান কর।" (বুখারি, আবু হুরায়রা রা:)। হযরত আবু বকর (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, "ক্ষমতার বলে অধীন চাকর-চাকরানী বা দাস-দাসীর প্রতি মন্দ আচরণকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (ইবনে মাজাহ) তিনি আরো বলেন, "কেউ তার অধীন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কেয়ামতের দিন তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে।"

শ্রমিকের দায়িত্ব চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। ইরশাদ হচ্ছে, 'শ্রমিক হিসাবে সেই ব্যক্তি ভালো, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' (সূর কাসাস : ২১৬) শ্রমিক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিবে এটা তার কর্তব্য। আর এ কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করলে তার জন্য দ্বিগুণ পুণ্যের কথা রাসূল (সা:) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও আদায় করে'। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, হে মানবজাতি, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। (সূরা আল-ফাতির, আয়াত-১৪)

শ্রমিকের অধিকার:

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শ্রমিককে কষ্ট দেয়া জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা মনে করে। এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, নবী করিম (সা:) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী, না বলে। কেননা আমরা সবাই আল্লাহর দাস-দাসী।" ওমর ইবনে হুরাইস (রা:) হতে বর্ণিত নবী করিম (সা:) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নিবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও নেকি লেখা হবে।

শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে উঠে শিল্প প্রতিষ্ঠান। একটি শিল্পের মালিক শ্রমিকদের শ্রম শোষণ করে অল্প সময়েই পাহাড় পরিমাণ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়। শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে, তাদের ঠকিয়ে গড়ে তোলে একাধিক শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কারখানায় তাদের কোনো অংশীদারিত্ব থাকে না। শ্রমিকের আরেকটি প্রণিধানযোগ্য অধিকার হলো লভ্যাংশের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব লাভ করা। এ ব্যাপারে মহানবী (সা:) বলেছেন, "মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।" (মুসনাদে আহমাদ) শ্রমিকের পেশা পরিবর্তন বা কর্মস্থল পরিবর্তনে অধিকার থাকবে। এতে কারও ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করে স্বাধীন সত্তায় বাধা প্রদান উচিত নয়। সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছে যে, শ্রমিককে তার এই মানবিক স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক ইচ্ছামত কাজ নির্বাচন করে নিতে বা এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করতে পারে না।

শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে উঠে শিল্প প্রতিষ্ঠান। একটি শিল্পের মালিক শ্রমিকদের শ্রম শোষণ করে অল্প সময়েই পাহাড় পরিমাণ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়। শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে, তাদের ঠকিয়ে গড়ে তোলে একাধিক শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কারখানায় তাদের কোনো অংশীদারিত্ব থাকে না। শ্রমিকের আরেকটি প্রণিধানযোগ্য অধিকার হলো লভ্যাংশের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব লাভ করা। এ ব্যাপারে মহানবী (সা:) বলেছেন, "মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।" (মুসনাদে আহমাদ)

শ্রমিকের পেশা পরিবর্তন বা কর্মস্থল পরিবর্তনে অধিকার থাকবে। এতে কারও ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করে স্বাধীন সত্তায় বাধা প্রদান উচিত নয়। সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছে যে, শ্রমিককে তার এই মানবিক স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক ইচ্ছামত কাজ নির্বাচন করে নিতে বা এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করতে পারে না।

শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যথাযথ মজুরিপ্রাপ্তি। মাসের পর মাস চলে যায় শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায় না। মালিকগোষ্ঠী বরাবরই